নাসীহাহ

আপনার খিদমতে একগুচ্ছ উপদেশ

শায়খ মুখতার আহমাদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Read between the lines…

কিছু বই পড়তে হয় এক-নিঃশ্বাসে, বিরতিহীন!
আর কিছু বই পড়তে হয় বহু-নিঃশ্বাসে,
থেমে-থেমে, বিরতি নিয়ে!
কিছু বই একবার পড়লেই শেষ হয়ে যায়।
আর কিছু বই পড়তে হয় বারবার! তবুও শেষ হয় না যেন।
কিছু বই লেখা হয় শুধুই পড়ে যাওয়ার জন্য
আর কিছু বই লেখা হয় ভাবনার খোরাক দেওয়ার জন্য!
কিছু বই পড়ার সময় থামতে হয় না, চিন্তা করতে হয় না
শুধুই পাতা উলটে যাওয়া!
আর কিছু বই পড়ার জন্য থামতে হয়,
সময় দিতে হয়, সময় নিতে হয়!
সাদা পৃষ্ঠায় থাকা কালো হরফকে
নিয়ে আসতে হয় মনের আঙ্গিনায়।
কিছু বই লেখা হয় সময় কাটানোর জন্য
আর কিছু বই লেখা হয় সময়কে ধরে রাখার জন্য!
তাই আপনাকে বলছি,
দেখার চেষ্টা করুন! তবে চোখটা বন্ধ করে!
পড়ার চেষ্টা করুন! তবে থেমে-থেমে!
শুধু পড়ার জন্য পড়ে যাওয়া নয়, বরং—
পড়ুন! থামুন! ভাবুন!

প্রতিটি লাইনের মাঝে চিন্তা করুন!
আমলের নিয়তে পড়ুন!
নইলে যে শুধুই পাতা উলটে যাবেন,
মৃত অন্তরকে জীবিত করতে পারবেন কি?

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : আল্লাহর ভয়ে ঝরে যে অশ্রু ৮

ফেরেশতাদের ভয় ৯

নবিদের কান্না ১০

আল্লাহর রাসূলের ভয় ১১

সাহাবিদের ভয় ১২

তাবিয়ি ও পরবর্তীদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ১৭

দশ প্রকার কান্না২০

দু'ফোঁটা চোখের পানির মূল্য ২২

আসুন! আল্লাহর জন্য কাঁদি ! ২৭

আল্লাহর ভয়ে কান্না করার আরও কিছু উপায় ২৮

আল্লাহকে ভয় করার উপকারিতা ২৯

আল্লাহর ভয় অর্জনের কিছু উপায় ৩০

গোপনে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা ৩২

গোপনে গুনাহ করার ভয়াবহ পরিণতি ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাদাকাহ ৩৭

গোপন দানের ফযীলত ৪২

দানশীলতার পুরষ্কার ৪৬

নবিজির দানশীলতা ৪৭

সাহাবিদের দানশীলতা ৪৯

তৃতীয় অধ্যায় : ইহসান : ইসলামের ভুলে যাওয়া শিক্ষা ৫৭

ইহসান শব্দের অর্থ ৬০

ইমাম আবূ দাউদের সৌন্দর্যমণ্ডিত আমল ৬২

আলি যাইনুল আবিদীনের ইহসান ৬৩
আমলকে সুন্দর করি ৬৫
ইহসান অর্থ যখন সদাচার ৬৭
পিতামাতার সাথে সদাচার ৬৮
পরিবারের সাথে সদাচার ৬৯
প্রতিবেশীর সাথে সদাচার ৭০
মন্দের বিনিময়ে ভালো আচরণ ৭১
নম্রতা ও সহনশীলতা ৭৫
নম্রতা ও সহনশীলতা প্রয়োগের কিছু ক্ষেত্র ৮০

চতুর্থ অধ্যায় : সবর ও তাকওয়া ৮৯
সালাফের জীবনে সবর ৯৩
সবর সম্পর্কে যত কথা ৯৮
শোকর ১০০
তাকওয়া ১০১
সবর এবং তাকওয়ার উপকারিতা ১০৩
সবর অর্জনের দুই উপায় ১০৯

পঞ্চম অধ্যায় : গর্ব ও অহংকার ১১১
বিনয় ১১৫
অহংকারের কুফল ১২০
অহংকারের প্রকারভেদ ১২৪
নিকৃষ্টতম অহংকার ১২৫
অহংকার ও বিনয়ের লক্ষণ ১২৫
সালাফের জীবনে বিনয়ের দৃষ্টান্ত ১২৯
অহংকারের প্রতিকার ১৩২
অহংকারীর প্রতি উপদেশ ১৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : এক অহংকারী জাতির কাহিনি ১৩৬
চক্রান্ত ১৪৫
মন্দ চরিত্র ১৪৮

বাইতুল মাকদিস ও শাম সম্পর্কে বর্ণনাসমূহ ১৫১

সপ্তম অধ্যায় : খ্যাতির মোহ ১৫৮

সালাফের জীবনে প্রচারবিমুখতা ১৫৯

খ্যাতি যখন ধোঁকা দেয় ১৬৪

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর ভয়ে ঝরে যে অশ্রু

একদিন মালিক ইবনু দিনার (রহিমাহুল্লাহ) যাচ্ছিলেন এক জায়গা দিয়ে। হঠাৎ দেখলেন পথের ধারে কান্নাকাটি করছে এক যুবক। যুবকটির পরনে পুরোনো জামা। চেহারা উস্কোখুস্কো। মালিক ইবনু দিনার যুবকটিকে দেখে চিনতে পারলেন। ওর নাম উতবা। মালিক দেখলেন, উতবার কপাল থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঘাম ঝরছে। অথচ তখন ছিল শীতকাল!

এই দৃশ্য দেখে খুবই অবাক হলেন মালিক ইবনু দিনার। তিনি উতবাকে প্রশ্ন করলেন, 'হে যুবক, তুমি কাঁদছ কেন? আর এই শীতের দিনে এভাবে ঘামছ কেন?'

জবাবে উতবা বলল, 'একবার এই জায়গায় আমি একটি গুনাহ করেছিলাম! আজ এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই গুনাহের কথা স্মরণ হলো। তাই আমি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছি!'[১]

দেখুন! আমাদের পূর্ববর্তী যুগের মুসলিমদের চিন্তাভাবনা কেমন ছিল। আর আমরা? আমরা সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত; অথচ আমাদের কোনো বিকার নেই! আমরা হেসে-খেলে বেড়াচ্ছি, দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত রয়েছি। যেন আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো কারণ নেই। এজন্যই যদি কেউ আমাদেরকে বলে, 'তুমি আল্লাহকে ভয় করো! ইত্তাকিল্লাহ!'—তাহলে এই কথাটিকে আমরা অপমানজনক মনে করি! আমরা ভেবে নিই, সে আমাকে অপমান করছে!

অথচ জ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হলে সে-ই আপনার প্রকৃত বন্ধু। দুনিয়াভর সম্পদ পাবার বদলে এমন বন্ধু পাওয়াই অধিক সৌভাগ্যের বিষয়।'

---

[১] তাম্বীহুল গাফিলীন, শাইখ আবূল লাইস সমরকন্দী।

ফেরেশতাদের ভয়[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ‘তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে।’[৩]

রাসূল ﷺ বলেন,

> ‘নিশ্চয়ই ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান অবস্থায় থাকে।’[৪]

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের চোখ থেকে সর্বদাই অশ্রু বইতে থাকে নদীর মতো। যখন তারা মাথা তুলে বলেন, ‘সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য! যেভাবে আল্লাহকে ভয় করা উচিত ছিল, সেভাবে আমরা আল্লাহকে ভয় করতে পারছিনা!’ জবাবে আল্লাহ বলেন, ‘বহু কসমকারী আমার নামে মিথ্যা কসম করে, কিন্তু তারা এ বিষয়ে জানে না।’

রাসূল ﷺ বলেন,

> ‘মিরাজের রাতে আমি দেখলাম, আল্লাহর ভয়ে জিবরীলের অবস্থা একটি শতছিন্ন কাপড়ের মতো হয়ে গেছে!’[৫]

একবার জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবি ﷺ-এর কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। নবি ﷺ বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন?’ জবাবে জিবরীল বললেন, ‘যেদিন থেকে আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে আমার চোখ কখনো শুকায়নি। সব সময় আল্লাহর ভয়ে আমি কাঁদছি। যদি আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হই আর তিনি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন—এই ভয়ে আমি কাঁদছি!’[৬]

ইয়াজিদ আর-রুকাশী বর্ণনা করেন, ‘আরশের চারপাশে কিছু ফেরেশতা আছেন। তারা সদাসর্বদা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকেন। তাদের চোখ থেকে নদীর মতো অশ্রুধারা বইতে থাকে। কিয়ামাত পর্যন্ত তারা এভাবেই কাঁদতে থাকবেন। তারা আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে কম্পমান আছেন, যেন বাতাস তাদেরকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, ‘হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা তো আমার

---

[২] মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, ইবনু কুদামা ﷺ।
[৩] সূরা নাহল, ১৬ : ৫০।
[৪] বাইহাকি, ৯১৪; তারিখু বাগদাদ, ১২/৩০৭।
[৫] মুসনাদু আহমাদ, ৪/২৫-২৬।
[৬] বাইহাকি, ৯১৫।

সাথেই আছো, তা হলে ভয় পাচ্ছ কেন?' জবাবে তারা বলেন, 'হে আমাদের রব! আমরা যেভাবে আপনার সম্মান ও মর্যাদার কথা জানি, যদি জমিনের বাসিন্দারাও সেভাবে আপনার সম্মান ও মর্যাদার কথা জানত, তা হলে তারা কোনো খাদ্য-পানীয় উপভোগ করার অবসর পেত না, বিছানায় শয্যা-গ্রহণের চিন্তা করত না! তারা মরুভূমিতে চলে যেত এবং যেভাবে গরু চিৎকার করে সেভাবে চিৎকার করতে থাকত!'

নবিদের কান্না

ওয়াহাব বলেন, 'জান্নাত থেকে অবতরণের পর আদম (আলাইহিস সালাম) ৩০০ বছর কান্না করেন। এই ৩০০ বছরে তিনি একবারের জন্যেও আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাননি।'

ওয়াহাব ইবনু আল-ওয়ারদ বলেন, 'নিজের ছেলের ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে তিরস্কার করলেন। এরপর নূহ (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।'[৭]

এই ঘটনার কারণে নূহ (আলাইহিস সালাম) তিন শ বছর ক্রন্দন করেন। এতে তাঁর চোখের নিচে পানি প্রবাহের দাগ বসে যায়।'

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন দাউদ (আলাইহিস সালাম) একটি ভুল করলেন, তিনি টানা ৪০ দিন আল্লাহর কাছে সিজদারত অবস্থায় পড়ে রইলেন। এই ৪০ দিন তিনি এমনভাবে কান্নাকাটি করেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি ভিজে যায়। আর সেখানে শেওলা ও লতাপাতা গজিয়ে উঠে। লোকেরা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে দেখতে আসত। আর মনে করত তিনি অসুস্থ। কিন্তু দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে কোনো অসুস্থতা ছিল না। আল্লাহর ভয়েই এই অবস্থা হয়েছিল তাঁর।'

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে যখন মৃত্যুর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চামড়া ফেটে রক্ত বের হতো।[৮]

---

[৭] সূরা হূদ, ১১ : ৪৭।

[৮] মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, ইবনু কুদামা ﵀।

আল্লাহর রাসূলের ভয়

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মেঘমালা দেখলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। একবার তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন, আরেকবার বেরিয়ে আসতেন। একবার সামনে যেতেন, আরেকবার পেছনে যেতেন। মেঘ যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে যেত, তখন তাঁর এই অবস্থা দূর হতো।'

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তুমি কি জানো, হয়তো তা সেই মেঘ-ই হবে, যে সম্পর্কে হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি বলেছিল, "এই তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে।"'[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত পড়তেন তখন তাঁর বুক থেকে পানি ফুটানোর মতো শব্দ হতো। তিনি এভাবে কান্না করতেন।[১০]

একদিন রাসূল ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছ থেকে কুরআন শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি কুরআন শুনাতে শুনাতে যখন এই আয়াতে এসে পৌঁছলেন,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

> 'আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মাতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের ওপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।'[১১]

তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'থামো, যথেষ্ট হয়েছে।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দেখলাম তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[১২]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে বলেন, 'নবিজির কান্না ছিল তাঁর হাসির মতোই মৃদু। তিনি উচ্চস্বরে কান্না করতেন না। গলার আওয়াজ উঁচু করতেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। যেভাবে হাসির সময় তিনি উচ্চস্বরে হাসতেন না বরং মৃদু হাসতেন বা মুচকি হাসতেন। কিন্তু কান্নার সময় তার চোখ জলে ভরে যেত। এরপর সেই অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকত। নবিজির পাশে কেউ থাকলে সে নবি ﷺ-এর বুক থেকে ফুটন্ত পানির মতো কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত। কখনো

---

[৯] বুখারি, ৪৪৫৪; মুসলিম, ১৪৯৭।
[১০] নাসায়ি, ১১৯৯; আবূ দাউদ, ৭৬৯।
[১১] সূরা নিসা, ৪ : ৪১।
[১২] বুখারি।

তিনি কাঁদতেন মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়ামায়া ও রহমত অনুভব করার কারণে, আবার কখনো কাঁদতেন উম্মাতের প্রতি ভালোবাসার কারণে, আবার কখনো কাঁদতেন উম্মাতের পরিণতির কথা ভেবে। আল্লাহর ভয়ের কারণেও তিনি কাঁদতেন। কুরআন তিলাওয়াত শুনলেও অশ্রু ঝরত নবিজির চোখ থেকে। এই কান্না ছিল ভক্তি-ভালোবাসা ও বিরহ মিশ্রিত। আল্লাহর প্রতি বিনীত হওয়ার কারণেই তিনি কাঁদতেন।'

সাহাবিদের ভয়

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলতেন, 'এটা আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে!'

তিনি আরও বলতেন, 'হায়! আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হতো। অথবা যদি একটি লতা হতাম, যা চিবিয়ে ফেলা হতো!'

একই কথা বলতেন তালহা, আবূদ দারদা এবং আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।

আরেকবার আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাতে টহল দিতে বের হয়েছিলেন। তখন তিনি একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনে এমনভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, কয়েকদিন পর্যন্ত বিছানায় পড়ে রইলেন।

আরেকবার তিনি একটি ঘাস উঠিয়ে নিলেন মাটি থেকে। আর বললেন, 'হায়! আমি যদি এই ঘাস হতাম! যদি সবাই আমার কথা ভুলে যেত। যদি আমি আমার মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম না নিতাম!'

অধিক ক্রন্দনের কারণে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেহারায় দুইটি কালো দাগ পড়েছিল।

আর উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হতো। যদি আমাকে কখনোই কবর থেকে উঠানো না হতো!'

আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'হায়! আমি যদি একটি ভেড়া হতাম আর আমাকে যবাই করে ফেলা হতো! যদি আমাকে রান্না করে ঝোল-মাংস খেয়ে শেষ করে ফেলা হতো!'

ইমরান ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি

ভস্মীভূত ছাই হতাম! আর বাতাস এসে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত!'

হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'হায়! যদি এমন কোনো ব্যক্তি পেতাম, যে আমার টাকা-পয়সার সব দায়িত্ব নিয়ে নিত, তা হলে আমি দরজা বন্ধ করে থাকতাম। আমার কক্ষে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিতাম না, যে পর্যন্ত না আমি মৃত্যুবরণ করছি, আর আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করছি।'

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর চেহারায় অশ্রু প্রবাহের একটি দাগ ছিল। যা দেখে মনে হতো যেন একজোড়া পুরোনো ফিতা।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলতেন, 'হায়! যদি আমার কথা সবাই ভুলে যেত!'

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের দেখেছি। তোমাদের কেউ তাঁদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহর কসম! সকালবেলায় তাঁদের ঘুম ভাঙত উসকো-খুসকো চুলে। ধূলিধূসরিত অবস্থায় ও ফ্যাকাশে চেহারায়। অধিক সিজদাহর কারণে তাঁদের হাঁটু ও কপাল ছিল ছাগলের হাঁটুর মতো খসখসে। তাঁরা রাত কাটাতেন আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, রুকু-সিজদাহ করে। আর ঘুম ভাঙার পর যদি তাঁদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো, তা হলে তাঁরা এমনভাবে কাঁপতেন যেভাবে ঝড়ের বাতাসে গাছপালা কাঁপতে থাকে। তাঁদের চোখ থেকে এমনভাবে অশ্রু ঝরত, যাতে তাঁদের পরিধেয় কাপড় ভিজে যেত। আল্লাহর কসম! এটাই ছিল তাঁদের অবস্থা। আর আজ আমি এমন লোকেদের দেখি যারা উদাসীন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আর বেঘোরে রাত কাটিয়ে দেয়।'[১৩]

মুসলিম ইবনু বশির বলেন, 'মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) খুব কান্নাকাটি শুরু করলেন। লোকেরা জানতে চাইল, 'আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'আমি কাঁদছি কারণ আমার সামনে এক বিরাট সফর অপেক্ষা করছে। অথচ এই সফরের জন্য তেমন কোনো পাথেয় সংগ্রহ করতে পারিনি। এই সামান্য পাথেয় নিয়ে এত দীর্ঘ সফর কীভাবে শেষ করব? হায়! কাল কিয়ামাতের দিনে সব মানুষের সাথে আমাকেও একত্রিত করা হবে। এরপর একদলকে বলা হবে জান্নাতে যেতে। আরেকদলকে বলা হবে জাহান্নামে যেতে। আমি তো জানি না আমি কোন দলের মধ্যে শামিল হব!' এই বলে আবূ হুরায়রা ক্রন্দন করতে লাগলেন।'[১৪]

---

[১৩] মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, ইবনু কুদামা ﵀।

[১৪] ইবনু সাদ, হিলইয়া।

উসমান ইবনু আবূ সু'দাহ বলেন, একবার তিনি উবাদা ইবনু সামিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখলেন একটি উপত্যকায় উপুড় হয়ে কান্নাকাটি করছেন। তিনি উবাদাকে বললেন, 'হে আবূ ওয়ালিদ! আপনি কান্নাকাটি করছেন কেন? জবাবে উবাদা বললেন, 'এই জায়গায় থাকাকালে নবি ﷺ-কে জাহান্নামের কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।'[১৫]

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো—

> তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ...[১৬]

তখন মাসজিদে নববির বারান্দায় থাকা সাহাবিরা এত বেশি কান্নাকাটি করলেন যে, তাদের দাড়ি ভিজে গেল এবং তাদের গাল দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাদের কান্নাকাটির শব্দ শুনে নবি ﷺ সেখানে এলেন। তিনিও তাদের সাথে কাঁদতে লাগলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হিসাবের ভয়ে কান্নাকাটি করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তা হলে তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এমন একদল লোকের উত্থান ঘটাতেন, যারা গুনাহ করত আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।'[১৭]

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন রাসূল ﷺ এই আয়াত পড়লেন—

> 'তোমরা সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর; যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।'[১৮]

তখন নবি ﷺ বললেন, 'জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আরও এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আরও এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। এখন এর রং কালো এবং এর অগ্নিশিখা কখনো নিভে যায় না।'

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একজন হাবশী বসে ছিল। সে এই হাদীস শুনে কাঁদতে লাগল। এমন সময় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সেখানে এলেন এবং রাসূল ﷺ-এর কাছে ঐ ক্রন্দনরত লোকটি সম্পর্কে জানতে

[১৫] আল-হিলইয়া, ভলিউম ৬, পৃ ১১০।

[১৬] সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৯-৬১

[১৭] বাইহাকি, তারগীব, ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা ১৯০।

[১৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪।

চাইলেন। নবি ﷺ বললেন, সে ইথিওপিয়ার অধিবাসী। এরপর তার কিছু নেক আমলের কথা বললেন। একথা শুনে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার ইজ্জতের কসম! আমার বড়ত্বের কসম! আমার মহান আরশের কসম! যখন কোনো বান্দা আমার ভয়ে ক্রন্দন করে, তখন তার জন্য আমি জান্নাতে হাসি-আনন্দের ব্যবস্থা করে দিই।"'

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন। অধিক ক্রন্দনের কারণে তাঁর চেহারায় দুইটি কালো দাগ বসে গিয়েছিল। একবার তিনি জুমার খুতবা দেওয়ার সময় সূরা তাকভীর-এর এই আয়াতটি পড়লেন—

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

'তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কী উপস্থিত করেছে।'[১৯]

এসময় আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। তিনি আর তিলাওয়াত করতে পারলেন না। আরেকবার রাত্রিকালীন টহল দেওয়ার সময় উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) একটি ঘর থেকে এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনলেন—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ

'আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।'[২০]

এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। প্রায় বিশ দিন ধরে তিনি অসুস্থ থাকলেন।[২১]

তামিম আদ-দারী (রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার এই আয়াতটি পড়লেন—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যারা দুস্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মুত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ।'[২২]

---

[১৯] সূরা তাকভীর, ৮১ : ১৪।

[২০] সূরা তূর, ৫২ : ৭-৮।

[২১] বাইহাকি, তারগীব, ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা ১৯৪।

[২২] সূরা জাছিয়াহ, ৪৫ : ২১।

এরপর সকাল হওয়া পর্যন্ত তিনি এই আয়াতটি বারবার পড়তে লাগলেন। আর কাঁদতে লাগলেন।

হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) প্রচুর কান্নাকাটি করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি এত কাঁদেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি জানি না আমার সামনে কী আছে! চিরকালের সন্তুষ্টি না কি চিরকালের অসন্তুষ্টি?'

সা'দ ইবনু আল-আখরাম বলেন, 'একবার আমি ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে হাঁটছিলাম। আর তিনি এক কামারের পাশ দিয়ে গেলেন। সেই কামার আগুনের মধ্য থেকে একটি জ্বলন্ত লোহার টুকরা বের করে আনলো। এই দৃশ্য দেখে ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সেই জ্বলন্ত লোহার দন্ড দেখে কাঁদতে লাগলেন!'

তাবিয়ি ও পরবর্তীদের মধ্যে আল্লাহর ভয়

হারাম ইবনু হাইয়ান বলতেন, 'আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটা গাছ হতাম! আর কোনো উট এসে আমাকে খেয়ে ফেলত। আমি যদি সেই উটের মলমূত্র হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতাম! হায়, আমাকে যদি কিয়ামাতের দিন বিচারের জন্য উঠানো না হতো। নিশ্চয়ই আমি সেই ভয়াবহ বিপদের দিনকে ভয় করি!'

যাইনুল আবিদীন আলি ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)-এর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যেত যখন তিনি ওযু করে সালাতের প্রস্তুতি নিতেন। লোকেরা বলত, 'আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন?' জবাবে তিনি বলতেন, 'তোমরা কি জানো না, আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?'

মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসি (রহিমাহুল্লাহ) রাতের অধিকাংশ সময় কান্নাকাটি করে কাটাতেন।

আর উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)-এর সামনে যদি মৃত্যুর আলোচনা করা হতো, তিনি এমনভাবে কাঁপতেন যেভাবে পাখির ছানা কাঁপতে থাকে। আর এমনভাবে কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত।

এক রাতে তিনি অনেক কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তাঁর সাথে বাড়ির লোকেরাও কান্নাকাটি করতে লাগল। তখন উমারের স্ত্রী ফাতিমা বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার এমন অবস্থা হয়েছে কেন? আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি

জবাব দিলেন, 'আমি সেই দিনের কথা স্মরণ করছিলাম, যখন মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। আর তাদের একদলকে জান্নাতে যেতে বলা হবে, আরেক দলকে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।'

একথা বলেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

একবার আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুর জেরুজালেমে গেলেন। তখন সেখানকার একটি খানকার পাশে এসে যাত্রাবিরতি করলেন। সেই খানকায় এসে উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) রাত্রিযাপন করতেন। খলীফা মনসুর জানতে চাইলেন, 'তোমরা যদি উমার ইবনু আবদিল আযীয-এর ব্যাপারে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে থাকো, তা হলে সেসব ঘটনা আমাকে বর্ণনা করো।'

জবাবে এক ব্যক্তি বলল, 'এক রাতে তিনি এই ঘরের ছাদের ওপর ছিলেন। এই ঘরটির ছাদ ছিল মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত। আমি দেখলাম ছাদের ওপর থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। ছাদের ওপর কী হয়েছে দেখার জন্য আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) সিজদাহরত অবস্থায় আছেন। আর তাঁর চোখ থেকে অবিরাম অশ্রুধারা বইছে! ছাদ থেকে সেই অশ্রু গড়িয়ে পাশের নালায় পড়ছে!'

ইবরাহীম ইবনু ঈসা আল-ইয়াশকারী বলেন, 'একবার আমি বাহরাইনের এক লোকের কাছে গেলাম। সেই লোকটি ছিল দুনিয়াবিমুখ। সে দুনিয়ার সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। সে একাকী সময় কাটাত। একবার সে আখিরাতের কিছু কথা স্মরণ করল আর মৃত্যুর আলোচনা করতে লাগল। এরপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আর এতেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল!'

মাসমা' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার আবদুল ওয়াহিদ ইবনি যাইদ খুতবা দিচ্ছিলেন। সেই খুতবায় উপস্থিত লোকের মধ্যে চারজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল!'

ইয়াজিদ ইবনু মুরশিদ (রহিমাহুল্লাহ) প্রায়ই কাঁদতেন আর বলতেন, 'আল্লাহর কসম! যদি আমার রব আমাকে বাথরুমে বন্দি করে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতেন, তবুও এটা আজীবন কান্নাকাটি করার জন্য যথেষ্ট হতো। অথচ তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়েছেন, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে। এরপরেও কীভাবে আমরা তাঁর অবাধ্য হতে পারি?'

সারি আস-সাকাতি বলেন, 'প্রতিদিন আমি আমার চেহারার দিকে তাকাই। আর ভয়ে-ভয়ে ভাবি, যদি আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে তিনি আমার চেহারাকে কালো

করে দেন!'[২৩]

পাঠক! এই ছিল ফেরেশতাবৃন্দ, আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) ও পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের মধ্যে থাকা আল্লাহর ভয়ের কিছু বিবরণ। তাদের থেকে আমাদেরই তো আল্লাহকে বেশি ভয় করা ও কান্নাকাটি করা উচিত।

আসলে আল্লাহকে ভয় করার বিষয়টি বান্দার গুনাহের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়। যার গুনাহ যত বেশি, সে আল্লাহকে তত ভয় করে—বিষয়টি এমন নয়। বরং যার অন্তর যত পরিষ্কার এবং যার অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে যত বেশি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান আছে, সে আল্লাহকে তত বেশি ভয় করে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।'[২৪]

আমরা তো মূর্খ ও অজ্ঞ! এ কারণেই আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করি আল্লাহর শাস্তি থেকে। আর আমাদের অন্তরের কাঠিন্যের ব্যাপারে কোনো চিন্তাভাবনা করি না।

যে অন্তর স্বচ্ছ, সেই অন্তরে সামান্য ইলমের ছোঁয়া পেলেই আগুন জ্বলে উঠে।

আর যে অন্তর যত কঠিন তাতে হাজার ওয়াজ নসিহত করলেও কোনো ভাবান্তর হয় না।

এজন্যই সালাফদের কেউ কেউ বলতেন, 'আমি এক দরবেশকে বললাম, "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" জবাবে তিনি বললেন, "নিজেকে সেই ব্যক্তির জায়গায় চিন্তা করো, যাকে চারদিক থেকে হিংস্র জীবজন্তু ও বিষাক্ত সাপবিচ্ছু ঘিরে আছে। যদি এক মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হও, তা হলে হিংস্র জন্তু তোমাকে খেয়ে ফেলবে অথবা কোনো সাপ-বিচ্ছু তোমাকে ধ্বংস করবে। তখন তোমার অন্তরে যে পরিমাণ ভয়ভীতি এবং সতর্কতা থাকে, তুমি আল্লাহর ব্যাপারে সেইরকম সাবধান হয়ে যাও!"'

বলাই বাহুল্য, এখানে সতর্কতা বোঝানোর জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নইলে আল্লাহর প্রতি ভয় আর সাপ-বিচ্ছুর প্রতি ভয় তো কখনোই এক নয়। আল্লাহকে ভয় করার মধ্যেও ভক্তি ও ভালোবাসা মিশে থাকে।

তবে দুনিয়াতে আমাদের অবস্থানকে সেই দরবেশের দেওয়া দৃষ্টান্তের সাথে মেলাতে বাধা নেই। কারণ, এই দুনিয়া একটি অভিশপ্ত জায়গা। একজন মুমিন সবসময় চিন্তা

[২৩] মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, ইবনু কুদামা ﵀, পৃ ৩১৯-৩২৩।
[২৪] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।

করবে, সে দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে অসংখ্য সাপ-বিচ্ছু ও বিষাক্ত জীবজন্তু।

যে মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, এই সাপ-বিচ্ছু তার চারপাশে নয় বরং তার অন্তরের ভেতরেই আসন গেড়ে আছে। এগুলো প্রকাশ পায় হিংসা, ক্রোধ, রাগ, ঘৃণা, গর্ব-অহংকার কিংবা লোক দেখানোর ইচ্ছার মধ্যে। যখনই সে অসতর্ক হয়, তখনই এগুলো তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খেতে থাকে। দুনিয়াতে আমাদের চোখের সামনে পর্দা পড়ে আছে, তাই আমরা ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেদিন গায়িবের পর্দা উঠে যাবে, আর আমাদেরকে কবরে মাটি চাপা দিয়ে আসা হবে, সেদিন আমরা নিজের চোখেই এসব সাপ-বিচ্ছু দেখতে পাব। এসব সাপ-বিচ্ছু মিশে আছে আমাদের আমল-আখলাক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য করণীয় হবে, মৃত্যুর আগেই নিজের ভেতরে বাস করা এসব সাপ-বিচ্ছুকে নির্মূল করা। নইলে আগামীকাল এরাই আমাদের কুরে কুরে খাবে। আর প্রতিমুহূর্তে দংশন করে বিষের যন্ত্রণা দিতে থাকবে।

দশ প্রকার কান্না

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'যাদুল মাআদ' বইতে দশ প্রকার কান্নার কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে—

১. দয়া ও রহমতের কারণে কান্না।

২. ভয় ও ভক্তির কারণে কান্না।

৩. ভালোবাসা ও বিরহের কারণে কান্না।

৪. খুশি ও আনন্দের কারণে কান্না।

৫. কোনো (দৈহিক) যন্ত্রণার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কান্না।

৬. (মানসিক) দুঃখের কারণে কান্না।

৭. ক্লান্তি ও দুর্বলতার কারণে কান্না।

৮. নিফাকের কারণে কান্না; যে কান্নায় চোখে অশ্রু আসে ঠিকই কিন্তু অন্তরে কোনো ভাবান্তর হয় না!

৯. ভাড়াটে বিলাপকারীর কান্না। ইসলামের আগের যুগে আরবে এ ধরনের কিছু বিলাপকারী পাওয়া যেত। কোনো অনুষ্ঠানে তাদেরকে পয়সা দিলে তারা এসে বিলাপ করে কাঁদতে থাকত। এভাবে ব্যাপক হইচই করে একটা

শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করত, যেন শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিরা মনে করে অমুক ব্যক্তির মৃত্যুতে সবাই খুব কষ্ট পাচ্ছে। এভাবে কান্নাকাটি করতে নবি ﷺ স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেছেন।

১০. নির্বোধের কান্না। যখন কোনো ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে, সে নিজেও কাঁদতে থাকে; অথচ সে জানে না অন্য ব্যক্তি কী কারণে কাঁদছে!

দু'ফোঁটা চোখের পানির মূল্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয়ে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলতে পারা গোটা পৃথিবীর প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি এবং মুগ্ধতার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। এটা এমন এক ব্যবসায়িক পণ্য, যার মূল্য হচ্ছে কিয়ামাতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এই চোখের পানি আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক প্রিয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

'আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবেন।'

নবি ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো দুটি ফোঁটা এবং দুটি চিহ্ন। একটি হলো আল্লাহর ভয়ে কান্নার অশ্রুফোঁটা এবং আরেকটি হলো আল্লাহর পথে প্রবাহিত হওয়া রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দুটো হলো, আল্লাহর পথে আঘাতের চিহ্ন এবং আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ফরয ইবাদাত আদায়ের চিহ্ন।'[২৫]

[২৫] তিরমিযি, ১৬৬৯।

আল্লাহর নবি ﷺ আরও বলেছেন,

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

‘জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না; ১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আর; ২. যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারায় নির্ঘুম রাত কাটায়।’[২৬]

নবি ﷺ বলেছেন,

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ

‘দুধ দোহন করার পর তা যেমন আর পালানে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সেও জাহান্নামে যাবে না।’[২৭]

সামুরা ইবনু জুনদুব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আল্লাহর নবি ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের সামনে এলেন। মদীনাতে আমরা তখন সারিবদ্ধ হয়ে ছিলাম। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,

إِنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا.... رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِيْ قَدْ أَهْوَى فِي النَّارِ، فَجَاءَتْهُ دَمْعَتُهُ الَّتِيْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَاسْتَنقَذَتْهُ مِنْ ذَلِكَ

‘গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। ...আমি দেখলাম আমার উম্মাতের এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সেই এক ফোঁটা অশ্রু এসে তাকে উদ্ধার করল, যা সে আল্লাহর ভয়ে কান্নার মধ্যে ফেলেছিল।’[২৮]

আল্লাহর নবি ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁর আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছিলেন। তারপরও নবি ﷺ-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি আল্লাহর ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। আবদুল্লাহ ইবনু শিখখীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবি ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন সালাত

[২৬] তিরমিযি, ১৬৩৯।

[২৭] তিরমিযি, ২৩১১।

[২৮] আল ওয়াবিলুস সাইয়িব ফিল কালিমিত তাইয়িব, ৮২; أخرجه الحافظ أبو الأعلى المديني بإسناد حسن جدا

পড়ছিলেন। কান্নার কারণে তাঁর বুক থেকে ডেকচি টগবগানির মতো শব্দ আসছিল।[২৯]

আবদুল্লাহ ইবনু ঈসা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কান্নার কারণে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেহারাতে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।[৩০]

সালামা ইবনু হাজল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মৃত্যুশয্যায় আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে এ জন্য কাঁদছি এমনটা ভেবো না। আসলে আমি কাঁদছি এটা ভেবে, আমার গন্তব্য তো অনেক দূর, অথচ আমার পাথেয় সামান্য। আমার অবস্থা এমন যে, আমি জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি ঘাঁটিতে অবস্থান করছি। জানি না জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝে কোন দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।[৩১]

ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় খলীফা ছিলেন উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবিদের অন্যতম যাদেরকে আল্লাহর নবি ﷺ তাঁদের জীবিত অবস্থাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, দাড়ি পর্যন্ত ভিজিয়ে ফেলতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনার সময় তো আপনি কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখলে এত বেশি কাঁদেন কেন? উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ

> ‘কবর হলো আখিরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে প্রথম ঘাঁটি। এখানে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলোতে মুক্তি পাওয়া তার জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে। আর এখানে মুক্তি না পেলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো আরও বেশি কঠিন হয়ে যাবে।’

উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবি ﷺ আরও বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

---

[২৯] নাসায়ি, ১২১৪।

[৩০] সিফাতুস সফওয়াহ, খ. ১; পৃ. ১০৭।

[৩১] যুহদ লি আহমাদ ইবনি হাম্বল, ১২৬।

‘আমি কবরের দৃশ্যের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর দেখিনি।’[৩২]

আবদুল আলা আত-তাইমি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ইলম-প্রাপ্তির পরও যদি কারও কান্না না আসে, তা হলে বুঝতে হবে যে উপকারী ইলম তার ভাগ্যে জুটেনি।[৩৩]

সুফয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কান্নার দশটি অংশ রয়েছে। যার নয়টি অংশ হলো লোক দেখানোর জন্য। একটি অংশ শুধু আল্লাহর জন্য। বছরে একবারও যদি সে অংশটি এসে পড়ে, তা হলে বান্দার নাজাতের জন্য সেটিই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

কিয়ামাতের দিন বান্দার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। সেদিন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্থান এবং সময় সাক্ষ্য দেবে। চোখের পানি তখন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ফলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। এজন্য সাবিত বুনানি (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন, মাসজিদের প্রতিটি খুঁটির কাছে আমি কুরআন পড়েছি এবং অশ্রু ঝরিয়েছি।

পাঠক! একবার নিজের অবস্থা নিয়ে ভাবুন! কোন সাহসে আপনি গুনাহ করছেন! যদি এই অবস্থায় মৃত্যু চলে আসে, তা হলে কী পরিণতি হবে আপনার?

জনৈক সালাফ সবসময় কান্নাকাটি করতেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘আমার ভয় হয়, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার দিকে তাকিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমি তোমার ওপর রাগান্বিত।’ এ কারণে সুফিয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) ক্রন্দন করে বলতেন, ‘আমার ভয় হয়, যদি মৃত্যুর সময় আমার কাছ থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয়!’

ইসমাঈল ইবনু যাকারিয়া বলেছেন, হাবীব ইবনু মুহাম্মাদ ছিলেন তার প্রতিবেশী। তিনি বলেন, ‘প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি শুনতাম সে কান্নাকাটি করছে। প্রতিদিন সকালেও তাকে কাঁদতে শুনতাম। তাই একদিন তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর কী হয়েছে? সকালেও সে কান্নাকাটি করে! সন্ধ্যায়ও কান্নাকাটি করে! তাঁর স্ত্রী জবাব দিল, ‘আল্লাহর কসম! যখন সন্ধ্যা আসে তখন সে চিন্তা করে, হয়তো আগামীকাল সকাল পর্যন্ত বাঁচবে না। আর যখন সকাল আসে, তখন সে চিন্তা করে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবে না!’

আমাদের নেককার পূর্বসূরিরা আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটি করতেন। অধিক ক্রন্দনের জন্য ইয়াযিদ আল-রাকাশীর সমালোচনা করা হতো। একবার তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল, ‘যদি জাহান্নামের আগুন শুধুমাত্র আপনার জন্যই সৃষ্টি করা

[৩২] তিরমিযি, ২৩০৮।

[৩৩] যুহদ লি আহমাদ ইবনি হাম্বল, ১৩৭।

হতো, মনে হয় আপনি এরচেয়ে বেশি কাঁদতেন না!' তিনি বললেন, 'আমার ভাই-বেরাদর, সাথি ও জিন-ইনসানের মধ্যে আমি বাদে আর কেউ কি জাহান্নামে যাবার অধিক উপযুক্ত আছে?'

একবার আতা আস-সুলামীকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনার এত দুঃখ কীসের?' তিনি বললেন, 'তোমার জন্যে আফসোস! মৃত্যু আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, কবর আমার বাড়ি, আর বিচারের দিনে আমাকে দাঁড়াতে হবে জাহান্নামের ওপরে রাখা পুলসিরাতের ওপর। অথচ আমি জানি না আমার কী পরিণতি হবে!'

একরাতে হাসান বাসরি (রহিমাহুল্লাহ) কান্নারত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলেন। তাঁর কান্নার শব্দ শুনে বাড়ির লোকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারা বলল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'একটি গুনাহের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি কান্নাকাটি করছি।'

আসুন! আল্লাহর জন্য কাঁদি!

কীভাবে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করব, আমাদের তো কান্না আসে না! এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের। বিশ্বখ্যাত ইসলামি প্রশ্নোত্তরের ওয়েবসাইট ইসলামকিউএ (islamqa.info)-তে একবার জনৈক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি একজন পুরুষ। আমি কখনো কাঁদি না। আমি হাদীসে পড়লাম, দুইটি চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না; যার একটি হচ্ছে, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। এখন আমাকে কিছু উপায় বলুন, কীভাবে আমি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে পারি? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন!'[৩৪]

আসুন, এর কিছু উপায় জানা যাক।

১. অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা ও এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা।

৩. নির্জনে আল্লাহর ভয়ে কান্না করার পুরস্কার নিয়ে চিন্তা করা।

৪. নিজের পাপ ও অন্তরের দুরাবস্থা নিয়ে চিন্তা করা। এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে কী পরিণতি হবে, এই বিষয় নিয়ে ভাবা।

৫. অনুতপ্ত হওয়া; আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের কত কমতি হয়েছে, অন্তরে এমন অনুভূতি জাগ্রত করা, বেশি বেশি তাওবা-ইসতিগফার করা।

[৩৪] ফাতওয়া নং ৪৬৯১১।

৬. খারাপ মৃত্যুর ভয়ে কান্না করা।

৭. অন্তর কোমলকারী খুতবা ও ওয়াজ-নসিহত শোনা।

আল্লাহর ভয়ে কান্না করার আরও কিছু উপায়

১. আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা, এ ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া।

২. জ্ঞান অর্জন করা।

৩. বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করা।

৪. মৃত্যুর পরে যে-সকল কঠিন পরীক্ষা ও ভয়-ভীতির সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা।

৫. বেশি বেশি কবরস্থান যিয়ারত করা।

৬. দুনিয়ার বদলে আখিরাতকে মূল লক্ষ্য বানানো।

৭. কুরআনের অর্থ নিয়ে চিন্তা করা।

৮. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত শোনা এবং অন্তর কোমলকারী বই-পুস্তক পড়া।

৯. বেশি বেশি ইসতিগফার করা ও নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া।

১০. সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া, খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা।

১১. কান্না না এলে জোর করে কান্না করা! কাঁদতে নিজেকে বাধ্য করা।

১২. ওয়াজ-নসিহত শোনা।

১৩. অন্তরের ব্যাধি থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। যেমন- হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।

১৪. বেশি বেশি নফল ইবাদাত করা।

১৫. দুনিয়ার তুচ্ছতা নিয়ে চিন্তা করা এবং দুনিয়াবিমুখ হওয়া।

১৬. ইয়াতীম-মিসকীনের প্রতি দয়ালু হওয়া; ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ও তাদেরকে খাবার খাওয়ানো, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা।

১৭. বেহুদা হাসি-তামাশা কমিয়ে দেওয়া।

১৮. নিজের আমলের ব্যাপারে ভীত থাকা। হয়তো আল্লাহ আমার আমল কবুল করবেন না—সবসময় এই চিন্তা করা।

১৯. নেককার পূর্বসূরিগণ কীভাবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন, সেই বর্ণনাগুলো পড়া

ও আখিরাত নিয়ে চিন্তা করা।

২০. অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া।

নীরবে-নিভৃতে আল্লাহর কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করা কোনো সহজ কাজ নয়। চাইলেই সবাই এই কাজ করতে পারে না। এই কাজটি কঠিন বলেই আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন, 'যারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে নির্জনে অশ্রুপাত করে, তাদেরকে বিচারের দিনে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেওয়া হবে।'

যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, মহানুভবতা ও উদারতা নিয়ে চিন্তা করে, আর যদি এর বিপরীতে বান্দা হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা, তুচ্ছতা, অপরাধ, অপারগতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা চিন্তা করে, তা হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের চোখে পানি চলে আসে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে।

আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পাশাপাশি আল্লাহর শক্তি ও শাস্তি নিয়েও চিন্তা করা উচিত। তখন আল্লাহর শাস্তির ভয়েও আমরা কাঁদতে পারব।

আল্লাহকে ভয় করার উপকারিতা

সাধারণত ভয় শব্দটিকে একটি নেতিবাচক বিষয় হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করার অনেক উপকারিতা আছে। এই ভয় অন্য আর দশটা দুনিয়াবি ভয়ের মতো নয়। আল্লাহকে ভয় করার কয়েকটি হিকমাহ এরকম—

১. প্রথম কথা হলো, আমরা আল্লাহকে ভয় করতে বাধ্য! কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিয়েছেন।

২. এটি ঈমানের শর্ত। আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া ঈমান অর্জন করা যায় না।

৩. রাসূল ﷺ ও সকল নবি-রাসূলগণ আল্লাহকে ভয় করতেন।

৪. আগের যুগের নেককার ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহকে ভয় করা।

৫. দুনিয়াতে সুখ শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্যও আল্লাহকে ভয় করে চলতে হয়। কারণ, মানুষের মন থেকে আল্লাহর ভয় উঠে গেলে সবখানে বিশৃঙ্খলা ও পাপাচার দেখা দেয়।

৬. যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, সে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

৭. আল্লাহর ভয় থাকার কারণে আমরা ভুলত্রুটি থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, অনুশোচনা ও তাওবা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাদাকাহ

এবার আমি আপনাদেরকে একটি ছোট্ট কাহিনি শোনাতে চাচ্ছি। কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন ডক্টর সালিহ আস-সালিহ (রহিমাহুল্লাহ)।

শাইখ বলছিলেন, 'এখন আমি আপনাদেরকে একটি সত্য কাহিনি শোনাতে চাই। কাহিনিটি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে সৌদি আরবে। আবারও বলছি, এটা সত্য ঘটনা! সত্য ঘটনা!'

এরপর শাইখ বললেন, 'আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগের ঘটনা। পরে এই ঘটনাটি বিভিন্ন রেডিও স্টেশনেও প্রচার করা হয়েছিল।

ইবনু জাদয়ান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তার অনেক উট ছিল। শীতের শেষে যখন বসন্তকাল আসত, তখন তিনি উটগুলোর অবস্থা দেখতে যেতেন। আল্লাহর রহমতে সবগুলো উট সুস্থ-সবল এবং সুস্বাস্থের অধিকারী ছিল। বসন্তকালে উটের বাচ্চা প্রসব হয়। বাচ্চাগুলো দুধ খাওয়ার জন্য মা উটনীর কাছে আসত। তাই ইবনু জাদয়ান তাদেরকে দেখতে গেলেন।

আল্লাহর রহমতে উটনীগুলো এত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল যে, ওদের ওলান দুধে পরিপূর্ণ থাকত। উটের বাচ্চা মা উটনীর কাছে যাওয়া মাত্রই সেই ওলান থেকে দুধ ঝরতে থাকত! আল্লাহ তাআলা তাকে এতই বরকত দিয়েছিলেন।

একদিনের ঘটনা স্মরণ করে ইবনু জাদয়ান বলেন, 'একদিন আমি মুগ্ধ হয়ে আমার উটনী আর তার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার স্মরণ হলো, আমার প্রতিবেশীর অবস্থা তো খুব খারাপ। সে খুবই গরিব। তার সাতটি ছোট ছোট মেয়ে আছে। তখন আমার খেয়াল হলো, আমি তো চাইলে তাদেরকে সাহায্য করতে

পারি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি এই উটনী ও তার বাচ্চাকে সাদাকাহ করতে পারি আমার গরিব প্রতিবেশীকে।

তখন আমি এই আয়াতের কথা স্মরণ করলাম—

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

‘কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।’[৪৩]

সেই উটনীটি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তাই আমি সেই উটনী ও তার বাচ্চাটি নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। আর কড়া নেড়ে বললাম, ‘আপনার জন্যে এটি আমার পক্ষ থেকে একটি উপহার। দয়া করে এই উপহার গ্রহণ করুন!’

একথা শুনে প্রতিবেশীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এতই খুশি হয়ে গেলেন যে, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না!

এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি সেই উটের দুধ থেকে উপকৃত হতে লাগলেন। সে ও তার মেয়েরা উটের দুধ খেত এবং উটকে বিভিন্ন কাজে লাগাত। উটের পিঠে লাকড়ি বহন করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। তারা উটের বাচ্চাটি বড় হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। বড় হলে সেটি বিক্রি করে তারা কিছু অর্থ পাবে। এভাবে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কিছুটা লাঘব হলো।

বসন্তকাল শেষ হয়ে এল। এরপর শুরু হলো কঠিন গ্রীষ্মকাল! চারিদিকে খরা, অনাবৃষ্টি আর উত্তাপ! কোথাও পানি পাওয়া যেত না। তখন বেদুইনরা হন্যে হয়ে চারিদিকে পানি আর ঘাসের খোঁজ করত। ইবনু জাদয়ান নিজেও ছিলেন একজন বেদুইন। তার যা কিছু সম্পদ ছিল সেগুলো নিয়ে সে ঐ জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল এবং পানির খোঁজ করতে লাগল। মরুভূমিতে ‘দুহুল’ নামে এক ধরনের গর্ত থাকে। এই গর্তের নিচে পানি পাওয়া যায়।[৪৪] মরুভূমির কিছু এলাকায় মাটির নিচে পানির প্রবাহ থাকে। ‘দুহুল’ হলো সেই প্রবাহের ওপরের মুখ। এসব গর্তের ব্যাপারে বেদুইনরা খুব ভালো খোঁজখবর রাখে। কারণ, মরুভূমিতে টিকে থাকার জন্য এগুলোই তাদের প্রধান সহায়।

---

[৪৩] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৯২।

[৪৪] https://saudigazette.com.sa/article/593814

ইবনু জাদয়ান বলল, 'একদিন আমি এমনই একটি গর্তে নেমে গেলাম, যেন সেখান থেকে কিছু পানি নিয়ে আসতে পারি।'

ডক্টর সালিহ বলেন, 'ইবনু জাদয়ান সেই গর্তে ঢুকল। আর তার তিন পুত্র গর্তের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। এভাবে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। কিন্তু গর্ত থেকে ইবনু জাদয়ান বের হয়ে এল না। এই দৃশ্য দেখেও ছেলেদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। এমনকি একদিন-দুইদিন করে তিনদিন কেটে গেল। অবশেষে তারা পিতার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিল।

তারা বলতে লাগল, 'হয়তো আমাদের আব্বাকে কোনো বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু কামড় দিয়েছে। এতে তিনি গর্তের ভেতরে মারা গেছেন। অথবা গর্তের ভেতরে মাটি ধ্বসে মারা গেছেন। কিংবা শ্বাসরুদ্ধ হয়েও মারা যেতে পারেন।'

তারা যেন পিতার মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এমন সন্তান থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই! আসলে ঐ সন্তানেরা পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মালিক হওয়ার লোভ করছিল।

তাই তিনদিন পর তারা বাড়ি ফিরে এল এবং পিতার অবশিষ্ট সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হলো তাদের বাবার একটি উটনী ছিল। বাবা সেই উটনীটি দান করেছিল তাদের গরিব প্রতিবেশীকে। একথা স্মরণ হবার পর তিন ছেলে মিলে গেল সেই প্রতিবেশীর কাছে। তাকে বলল, 'আপনি আমাদেরকে আব্বার দেওয়া সেই উটনী ফিরিয়ে দিন। এর বদলে আপনাকে অন্য একটি উট দিচ্ছি। আর যদি এতে রাজি না হন, তা হলে আপনাকে কিছুই দেব না। আর আগের উটনীটাও জোর করে কেড়ে নেব!'

একথা শুনে প্রতিবেশী আশ্চর্য হয়ে গেল! সে বলল, 'আমি তোমাদের বাবার কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করব।' তখন ছেলেরা বলল, 'আমাদের আব্বা তো মারা গেছে!'

প্রতিবেশী বলল, 'কীভাবে মারা গেছে? কোথায় মারা গেছে?'

তখন ছেলেরা সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দিল। তারা বলল, তাদের পিতা মরুভূমির একটি গর্তে নেমে পানি খোঁজ করছিল। এরপর সেখান থেকে বের হতে পারেনি।

একথা শুনে প্রতিবেশী চিৎকার করে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমাকে এক্ষুণি ঐ জায়গায় নিয়ে যাও! তোমাদের উটনী নিয়ে যাও। এটা নিয়ে যা খুশি তাই করো। এর বিনিময়ে অন্য উট দেওয়ার দরকার নেই। শুধু আমাকে তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে যাও!'

এরপর ছেলেরা সেই প্রতিবেশীকে মরুভূমির ঐ জায়গাটিতে নিয়ে গেল। ঐ প্রতিবেশী নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে আর হাতে একটি মোমবাতি নিয়ে সেই গর্তে নেমে গেল। এরপর হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের ভেতরে যেতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে সে কিছুটা আর্দ্রতা ও ভেজা মাটির ঘ্রাণ পেল। আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সে একজন মানুষের কাতরানোর শব্দ শুনতে পেল!

অন্ধকারের মধ্যে ভালোমতো হাতড়ানোর পর সে বুঝতে পারল, এটা আসলে একজন মানুষের মাথা! আর সেই ব্যক্তি ছিল ইবনু জাদয়ান!

প্রতিবেশী ইবনু জাদয়ানের মুখের কাছে হাত নিয়ে দেখল, এখনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে! তার মানে ইবনু জাদয়ান এখনো বেঁচে আছে! এক সপ্তাহ ধরে এই গর্তে থাকার পরেও তার মৃত্যু হয়নি! কী আশ্চর্য ঘটনা!

প্রতিবেশী ইবনু জাদয়ানের চোখে একটি কালো পট্টি বেঁধে তাকে বাইরে নিয়ে এল। যেন হঠাৎ সূর্যের আলোতে এসে তার চোখ ঝলসে না যায়। এরপর তাকে কিছু খেজুর আর পানি খাওয়ালো। এরপর তাকে নিজের পিঠে করে বাড়িতে নিয়ে এল এবং ধীরে ধীরে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলল। এরপর প্রতিবেশী জানতে চাইল, 'আল্লাহর নামে প্রশ্ন করছি! আমাকে বলুন, এই এক সপ্তাহ ধরে মাটির নিচের গর্তে আপনি কীভাবে বেঁচে ছিলেন? এখানে তো কোনো মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়!'

ইবনু জাদয়ান বলল, 'আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা বলছি! নিঃসন্দেহে ঘটনাটা খুবই আশ্চর্যজনক। আমি পানির খোঁজে গর্তে নেমে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। গর্তের নিচে পানি ছিল। চারদিক থেকে আমার কাছে পানি আসতে লাগল। পথ হারানোর পর আমি ভাবলাম, আপাতত এই পানির কাছে থাকি। অন্তত পানি পান করে হলেও বেঁচে থাকতে পারব। কিন্তু শুধু পানি খেয়ে আর কতদিন টিকে থাকা যায়! প্রচন্ড ক্ষুধায় আমি কাতর হয়ে গেলাম। কিছুতেই ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলাম না। তিনদিন পর ক্ষুধার কষ্ট প্রকট আকার ধারণ করল। যেন আমার দেহকে খেয়ে ফেলতে লাগল। তখন আমি পিঠের ওপর ভর করে শুয়ে পড়লাম আর নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম। আমার জীবন-মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিলাম। এমন সময় আমি অনুভব করলাম, আমার মুখের ওপরে কে যেন দুধ ঢেলে দিচ্ছে! সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, একটি দুধের পাত্র আমার মুখের কাছে আসছে। আমি সেই পাত্র থেকে দুধ পান করতে লাগলাম। আমার ক্ষুধা মিটে গেলে সেই পাত্রটি আবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত। এই ঘটনা দিনে তিনবার করে ঘটতে লাগল। কিন্তু শেষের দুই দিন আমি আর দুধের পাত্র দেখতে পাইনি। জানি না কী

কারণে এটা বন্ধ হয়ে গেল!'

একথা শুনে প্রতিবেশী বলল, 'এর কারণ আমি জানি! তুমি সেটা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে! তুমি আমাকে যে উটনী দিয়েছিলে আমি সেই উটনীর দুধ পান করতাম। কিন্তু গত দুইদিন আগে তোমার ছেলেরা এসে সেই উটনীটা কেড়ে নিয়ে যায়। তারা বলল, তুমি না কি মারা গেছ! এবার আমি সব বুঝতে পারছি! আমার ধারণা, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে উটনী আমাকে দান করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেই উটনীর দুধ খাইয়েছিলেন অলৌকিকভাবে!'

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! সাদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ মিটিয়ে দেয়, বিপদ থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহ বলেন,

> 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।'[৪৫]

গোপন দানের ফযীলত

কিয়ামাতের সেই ভয়াবহ দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাওয়ার জন্য অন্যতম আমল হলো গোপনে দান-সাদাকাহ করা।

কুরআন-হাদীসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করতে বলা হয়েছে। মানুষের অভ্যাস হলো, সে মনে করে ধনসম্পদ তার নিজের হাতের কামাই। এগুলোর মালিকও সে। বাস্তবতা হলো, তার কাছে থাকা সম্পদের প্রকৃত মালিক সে নয়। আসলে এগুলো আল্লাহ তাআলার সম্পদ, যা তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষা করা। এজন্যই একজন মারা যাওয়ার পর অন্যরা সে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। বাস্তবেই যদি এগুলো ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ হতো, তা হলে যার মালিকানায় থাকত সে মৃত্যুর সময় সেগুলো নিয়ে যেত। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় দান-সাদাকাহর কথা বলার পাশাপাশি আল্লাহ এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এসব সম্পদের মালিকও তিনি। সূরা বাকারার শুরুতে তিনি মুত্তাকী লোকদের চারটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন,

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

[৪৫] সূরা ত্বালাক, ৬৫ : ২-৩।